আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পথিকৃৎ রসায়নবিজ্ঞানী

১৮৬১ সালের ২ আগস্ট প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে, বছরটি রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়, কেননা ঐ বছর বিজ্ঞানী ক্রুকস থলিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। আরেকটি কারণেও ১৮৬১ সাল প্রতিটি বাঙালির কাছে স্মরণীয়, কেননা এই বছরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেমন বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে আধুনিক ধারণা প্রকাশের বাহন করে পৃথিবীর সামনে গৌরবের আসনে বসিয়েছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান ছিল রাড়ুলি গ্রামে। এক সময়ে তা বাংলাদেশের যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে তা খুলনা জেলার মধ্যে আসে। কপোতাক্ষ নদীর তীরে এই গ্রাম। ঐ একই নদীর তীরে আর একটি বিখ্যাত গ্রাম সাগড়দাঁড়ি, যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা বাংলার প্রথম মহাকাব্যের কবি মধুসূদন দত্ত।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় মৌলভী সাহেব নিযুক্ত করে খুব ভালভাবে ফার্সি শিখেছিলেন এবং তিনি কিছু আরবীও জানতেন। হরিশ্চন্দ্র অনেক সময় বলতেন যে, যদিও তিনি এক গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তবু তাঁর মন-মানস তৈরি হয়েছে হাফিজের 'দিওয়ান' দিয়ে। শোনা যায় হরিশ্চন্দ্র লুকিয়ে মুরগির মাংসের আস্বাদও গ্রহণ করেছিলেন। পিতার কাছ থেকে প্রফুল্লচন্দ্র যে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিলেন তাই তাঁর সারাজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, এমানুষটি মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আগাগোড়া বাঙালি। প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ এবং নির্ভেজাল বাঙালি। ইতিহাসের পাতায় যে কয়েকজন মানুষ অনন্তকাল ধরে 'বাঙালি' এই শব্দের প্রতিভূ হয়ে থাকবেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন।

আবহমান কালের হিন্দু-মুসলিম যৌথ সংস্কৃতির ফসল প্রফুল্লচন্দ্র রায়। চৌদ্দ, পনের এবং ষোড়শ শতকের মুসলমান পীরগণ ইসলামের বাণী নিয়ে দক্ষিণ বাংলার নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করতে থাকেন। এঁদের একজন ছিলেন খাঁজা আলী— যিনি ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাটের কাছে ষাটগম্বুজ মসজিদটি স্থাপন করেছিলেন। রাড়ুলি গ্রামের কাছে আরো একটি মসজিদ তিনিই স্থাপন করেছিলেন, একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মজীবনীতে প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্বপুরুষরা জাহাঙ্গীরের সময় সম্রাটের কাছ থেকে কয়েকটি গ্রামের দান পেয়ে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে এসেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তাঁর প্রপিতামহ

মানিকলাল রায় নদীয়া-যশোরের কালেক্টরের দেওয়ান হয়েছিলেন। দেওয়ান হিসেবে তাঁর আয় ছিল প্রচুর, কেননা শোনা যায় যে, তাঁর কর্মস্থল কৃষ্ণনগর থেকে মাটির হাঁড়ি ভর্তি করে কোম্পানির সিক্কারুপি অর্থাৎ টাকা গ্রামের বাড়িতে আনা হত। অবশ্য ডাকাতদের চোখে ধুলা দেয়ার জন্য হাঁড়ির ওপরে বাতাসা দেয়া থাকত, লিখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র।

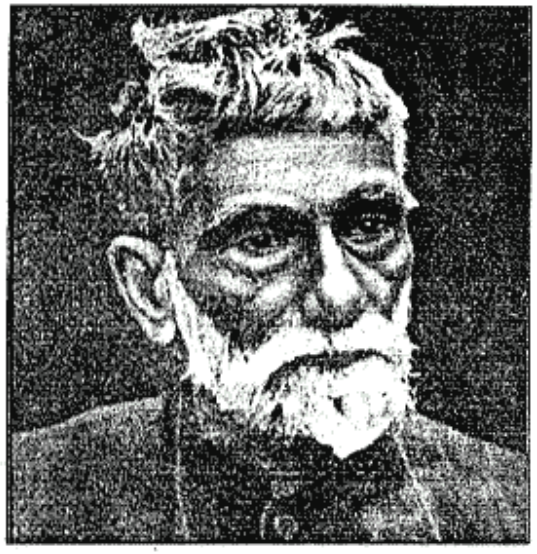

পিতামহ আনন্দলাল রায় যশোহরের সেরেস্তাদার হিসেবে আরো সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজি শিখতে পাঠিয়েছিলেন ১৮৩৬ সালে। এখানেই হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু আনন্দলাল রায়ের হঠাৎ মৃত্যু হলে তাঁকে লেখাপড়া শেষ না করেই গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়।

পঁচিশ বছর বয়সে হরিশ্চন্দ্র রায় তাঁদের সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি যে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উদার সংস্কৃতির মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায় এই ব্যাপার থেকে যে, তিনি ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন তো বটেই, ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান কম ছিল না। বেকনের 'নোভান অরগ্যানাম' তিনি পুত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তিনি কলকাতার শিক্ষিত সমাজে যাতায়াত করতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্টদাস পাল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি ওস্তাদ রেখে বেহালা বাজানো শিখেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হরিশ্চন্দ্র শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাড়ুলি গ্রামে তাঁর চেষ্টাতেই একটি মিডল ইংলিশ স্কুল এবং একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর জমিদারী খুব বড় ছিল না— বছরে আয় হয়তো ছয় হাজার টাকার বেশি হত না। কিন্তু তবু এ আয় থেকেই তিনি গ্রামের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর দুই বড় ভাই গ্রামের স্কুলেই লেখাপড়া শুরু করেন।

১৮৭০ সালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম কলকাতা আসেন এবং তিনি লিখেছেন যে, ঐ সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা প্রথম চালু হলেও গোঁড়া হিন্দুরা কলের পানি পান করতে চাইত না। অবশ্য ধীরে ধীরে অন্তত এ ব্যাপারে তাদের কুসংস্কার চলে যায়। সুয়েজ খাল এ সময়ে খোলা হলে লন্ডন, লিভারপুল, গ্লাসগো কলকাতার কাছে চলে আসে এবং কলকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দুঃখের বিষয় কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য এ সময় থেকেই ধীরে ধীরে মাড়োয়ারিদের হাতে চলে যায়। প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন, 'একটি স্বর্ণসুযোগ যা একবারই কোন জাতির জীবনে আসে তাকে ছিনিয়ে নিতে দেয়া হল। বাংলা তার সুযোগ চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলল।' বলাই বাহুল্য মাড়োয়ারি-ইস্পাহানিদের হাতে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী এ সময় থেকেই আটকা পড়ে যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর বড় ভাই প্রথমে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সহপাঠীরা 'বাঙ্গাল' বলে ক্ষেপাত এবং একশ'-দেড়শ' বছর পরেও কলকাতার অধিবাসীদের এ ব্যাপারে মানসিকতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন যে, তিনি এই সব অলস বাক্যবাগীশদের প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়ের সামরিক কৃতিত্বের কথা অথবা বাংলার মিল্টন মধুসূদন দত্ত, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের কথা বলেও থামাতে পারতেন না।

স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস ও ভূগোল এবং এই দুই বিষয়েই তিনি পরীক্ষায় পুরো নম্বর পেতেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়েও তিনি এ সময় প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। বিশেষকরে মনীষীদের জীবনী তাঁকে আকর্ষণ করত সবচেয়ে বেশি। নিউটন, গ্যালিলিও'র জীবনী এ সময়েই তিনি পড়েছিলেন।

দুঃখের বিষয় ১৯৭৪ সালে যখন তাঁর বয়স তের তখন তাঁকে প্রচণ্ড রকমের রক্ত আমাশয় রোগে আক্রমণ করে। এই রোগের কবল থেকে তিনি সারাজীবনেও বোধ হয় সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেননি।

স্কুল পরিত্যাগ করে তাই তাঁকে ঘরে বসেই লেখাপড়া করতে হত। অবশ্য একদিক দিয়ে এতে তাঁর ভালই হয়েছিল, কেননা স্কুলের বাঁধাধরা রুটিনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি ইচ্ছামতো পড়াশোনা করতে পারতেন। এই সময়েই তিনি নিজে নিজেই ল্যাটিন শেখা শুরু করে দেন এবং কিছুটা ল্যাটিন রপ্ত করার ফলে কারো সাহায্য ছাড়া ফরাসি ভাষা শেখাও তাঁর পক্ষে আর কষ্টকর হল না। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের আকর্ষণই তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে বেশি এবং তাঁর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে, ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তিনি ভালভাবেই পরিচিত হয়েছিলেন।

স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল হওয়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র এলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে সব শিক্ষকই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। সেই যুগে এই সব সমাজ-সংস্কার করা কিভাবে হিন্দুদের হাতে সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন আজকাল তা চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু হাসিমুখে তাঁরা সব কিছুই সহ্য করে যেতেন।

বাংলাইন্টারনেট.কম

এলবার্ট স্কুলের এইসব শিক্ষকদের কাছে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিল, তাই তিনি আবার হেয়ার স্কুলে ফিরে যেতে চাইলেও ঐ শিক্ষকরাই তাঁকে ফিরে যেতে দেননি। তাঁর শিক্ষক আদিত্য কুমার চ্যাটার্জির কথা তিনি লিখেছেন, 'আমি আমার চোখের সামনে যখন তাঁর হাসিভরা মুখটি দেখি যেন তাঁর সমস্ত অবয়ব থেকে একটা পবিত্র প্রভা বিকীর্ণ হত।'

এই সময়েই রুশ-তুর্কি যুদ্ধ শুরু হয় এবং ওসমান পাশা ও আহমেদ মুখতার পাশা যে অতুলনীয় সাহসের সঙ্গে তাঁদের দেশ রক্ষা করেছিলেন তা কিশোর প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি লিখেছেন, 'বলাই বাহুল্য আমার সব সহানুভূতি ছিল তুর্কিদের দিকে।'

এলবার্ট স্কুল থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর শিক্ষকরা যেরকম আশা করেছিলেন সেরকম ফল তিনি করতে পারেননি যে কোন কারণেই হোক। কিন্তু সেজন্য তিনি নিজে বিশেষ হতাশ হননি। এরপর তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন, কেননা প্রথমত এটি ছিল একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা ভারতীয়রা নিজেরা গড়ে তুলেছে এবং দ্বিতীয়ত এখানে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তাঁকে সকলে প্রায় দেবতার মতো ভক্তি করতেন। প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য ইংরেজি ছাড়াও প্রথম আর্টস পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্র এবং ব্যাচেলর অব আর্টস পরীক্ষার জন্য রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের বিষয় দুটি তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে পড়তে হত এবং সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন আলেকজান্ডার পেডলার (পরবর্তীকালে স্যার) যিনি তাঁকে রসায়নে পরীক্ষণের দিকে আকৃষ্ট করে তোলেন।

এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম কেননা ব্যর্থ হলে আমার সহপাঠীদের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হবে জানতাম।' কিন্তু তবু এটা গোপন থাকল না এবং স্কুলের পরীক্ষায় ভাল করা একজন ছাত্র বলেই ফেললেন যে, প্রফুল্লচন্দ্রের নাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারের এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। কিন্তু স্টেটসম্যান পত্রিকায় সত্যিই যেদিন সংবাদ বেরুল যে, তিনি এই গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়েছেন সেদিন তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছিলেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম বি.এসসি. পরীক্ষার জন্য ভর্তি হন। তাঁর বিষয় ছিল রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিদ্যা অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, রসায়ন তাঁর আসল আকর্ষণ। রসায়নে তাঁর শিক্ষক ছিলেন আলেকজান্ডার ক্রাম ব্রাউন (পরবর্তীকালে স্যার)। ক্রাম ব্রাউনের জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। তিনি গণিতের সমস্যা নিয়েও চিন্তা করতেন এবং এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর অবাদন ছিল। জৈবরসায়ন শাস্ত্রে তাঁর গ্রাফিক ফর্মুলাপদ্ধতি এই বিষয়ের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন, 'সাতচল্লিশ বছর পরেও যে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তখন আমি আমার প্রিয় বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি তা স্মরণ করতে পারি।'

এই সময় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর 'বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারত' এই বিষয়ের ওপর এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেন। বহু পরিশ্রম করে প্রফুল্লচন্দ্র একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যার জন্য তাঁকে রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়েও কিছুদিন বেশ পড়াশোনা করতে হয়েছিল। পুরস্কার তিনি অবশ্য পাননি কিন্তু তাঁর প্রবন্ধকে পুরস্কারের যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। পরে তিনি জেনিছিলেন যে, পরীক্ষকরা মন্তব্য করেছিলেন, 'আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিক্ত অভিযোগে ভরা' প্রফুল্লচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি পরে 'এসে অন ইন্ডিয়া' নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং উদারনৈতিক ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র তার প্রশংসা করেছিল।

যথাসময়ে প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নশাস্ত্রে তাঁর গবেষণা সম্বলিত একটি প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করেন এবং তাঁকে ডি.এসসি. ডিগ্রি দেয়া হয়। 'অবশ্যই আমি জানতাম যে, আমি ডিগ্রি পাবই', তিনি লিখেছেন। তার পরেও আরো শেখার জন্য আরো এক বছর তিনি এডিনবরায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তাঁকে হোপ পুরস্কার বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন সমিতির সহ সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন (সভাপতি ছিলেন ক্রাম ব্রাউন)।

১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক ছ'বছর পরে দেশে ফিরে আসেন। বাংলার শিক্ষা বিভাগে রসায়নে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্যে তিনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু কোনই লাভ হয়নি। প্রায় এক বছর তাঁর কোন চাকরি ছিল না এবং জগদীশচন্দ্র বসুর গৃহে তিনি অতিথি হিসেবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'আমার মতো যোগ্যতার একজন ব্রিটিশ রসায়নবিদকে আমদানি করলে ভারত-সচিব তাঁকে অবিলম্বে ভ্রমণভাতাসহ ইম্পেরিয়াল সার্ভিসে যোগদান করতে দিতেন।'

শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্রিটিশ সরকার মাসিক আড়াইশ' টাকা বেতনের একটি পদে নিয়োগদান করেন, যা অবশ্য পরে ভারত-সচিবের অনুমতিক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা হবে বলা হয়েছিল। ব্রিটিশ-ভারতে বিজ্ঞানী হওয়ার মাশুল এভাবে দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন।

ধীরে ধীরে শিক্ষকতার সঙ্গে তিনি গবেষণার কাজও শুরু করেন। ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে তাঁরই দেয়া নকশায় প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন রসায়নবিজ্ঞান ভবন তৈরি হয় এবং এখানেই প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'পারদের ওপর শীতল অবস্থায় ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড দিয়ে মারকিউরাস নাইট্রেট বেশি করে তৈরি করার সময় একটা হলুদ কেলাসিত বস্তুর উদ্ভব দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে এটা একটা বেসিক সল্ট বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু জোরালো এসিড দ্রবণে এ ধরনের লবণের উদ্ভব সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে, এটি একটি মারকিউরাস সল্ট এবং নাইট্রেটও। সুতরাং এই উল্লেখযোগ্য যৌগটি নিয়ে গবেষণা করলে ভালই ফল পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হল।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এ ধারণা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কালক্রমে তিনি নাইট্রেটসমূহের ওপর একজন স্বীকৃত অথরিটি হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর গবেষণার জন্যই নাইট্রাইট যৌগ যে অস্থিতিশীল বস্তু নয় তা রসায়নবিদ্যা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সময়েই তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসি রসায়নবিদ এম. বেরথেলোর যোগাযোগ হয় এবং ভারতীয় রসায়নের ব্যাপারে তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনের আর একটি মনুমেন্টাল কাজ 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমস্ত পৃথিবীর বিদ্বান সমাজ তার ভূয়সী প্রশংসা করে। ১৯১২ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সাম্মানিক ডি.এসসি. ডিগ্রি প্রদান করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন যে, তাঁর খ্যাতি প্রধানত এই গ্রন্থের মাধ্যমেই, কেননা গ্রন্থটি বিষয়ের ওপর চূড়ান্ত গবেষণামূলক অবদান।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই গ্রন্থ যখন তিনি রচনা করছিলেন তখনই তিনি তাঁর জীবনের আর একটি বিখ্যাত কাজ 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস' শুরু করেন। ইউরোপে থাকার সময়েই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেখানে শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্পের বিপুল উন্নতির ইতিহাস আসলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলিরই বিজয়ের ইতিহাস। কিন্তু বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কিছুমাত্র উদ্যোগও দেখা যায় না। এই চিন্তা থেকেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রথমে সালফিউরিক এসিড তৈরি করার চিন্তা করেন, কেননা এই এসিডটি হল 'শিল্পের জননী'। এরপর কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলেন সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। দেশী জিনিস প্রথম দিকে বিক্রি করাও কষ্টকর ছিল এবং প্রথম যেদিন তিনি সিরাপ ফো'র আয়োডাইডের অর্ডার পেয়েছিলেন সেদিন তিনি লিখেছেন যে, তাঁর আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কলেজের শিক্ষকতা এবং গবেষণার কাজ শেষ করে প্রতিদিন বিকেলে তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালে এসে কাজ শুরু করতেন। 'সৌভাগ্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের কাজেই ছিল আমার আনন্দ', লিখেছেন তিনি। এর ফলেই বেঙ্গল কেমিক্যাল সে যুগে বাংলার নবীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হয়ে উঠেছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র কারখানা বাংলার শিল্পায়নে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলাবাহুল্য।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (স্যার পি. সি. রে) জীবনের অধিক সময় তাঁর ল্যাবরেটরির একটি ঘরে চিরকুমারের জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, পুরস্কার কিছুরই ওপর তাঁর কোন লোভ ছিল না। খদ্দর পড়তেন, একটা সাধারণ কোট আর খাটো করে পড়া ধুতি এই ছিল তাঁর বেশবাস। এই সৌম্যকান্তি ঋষি সব বাঙালির সামনে যে ত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তার কোন তুলনা নেই। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে বিজ্ঞান কলেজেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বাংলাইন্টারনেট.কম